आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.________

दिनांक/Date. ২৯/৮/2020

# আমার অন্তিম বার্তালাপ

## আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

খুব শিগগির বিশ্বভারতী প্রকৃত অর্থেই *বিশ্ব*-ভারতী হতে চলেছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ ছড়িয়ে দিতে, যা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি কারণ এর আগে তারজন্য উপযুক্ত কোনও পদক্ষেপ করাই হয়নি। ১৯৫১ সালের বিশ্বভারতী আইনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই শিক্ষাভাবনা; যে আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম আচার্য তথা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। বিশ্বভারতী আইনের ৬(৭) ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে:

'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে বা তার লক্ষ্য ও আদর্শের উন্নতিবিধানের জন্য ভারতের যে-কোনও জায়গায় ক্যাম্পাস, বিশেষ সেন্টার, গবেষণাকর্মের জন্য বিশেষ পরীক্ষাগার বা তার অন্যকোনও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা থাকবে বিশ্বভারতীর।'

মাননীয় আচার্য ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীর বিশেষ ব্যক্তিগত সদিচ্ছায় উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে বিশ্বভারতীর একটি উপকেন্দ্র (স্যাটেলাইট ক্যাম্পাস) গড়ে তোলা সম্ভবপর হচ্ছে। মাননীয় আচার্যের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করেন ভারত সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক; যিনি বিস্তারিত প্রকল্প-প্রতিবেদন(ডিপিআর) রচনার প্রত্যেকটি স্তরে মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। বস্তুত, রামগড়ে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের পরিকল্পনা কবিকে সম্মান-জ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবেই আদর্শ জায়গা, কারণ জানা যায় এখানেই তাঁর অন্যতম সৃষ্টি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র মূল ভাবনা কবির মনের মধ্যে এসেছিল যা তাঁর নোবেল প্রশস্তিপত্রে উল্লিখিত আছে। তাছাড়া কবি তাঁর কন্যাদের(বিশেষ করে দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য) এই পাহাড়ি জনপদে নিয়ে যেতেন যাতে বোঝা যায় জায়গাটার প্রতি

কবির কতখানি মনের টান ছিল। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পরিকল্পনা ছাড়াও কবি এখানে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গান রচনা করেন, যাতে বোঝা যায় কবির সৃষ্টিকাজের প্রেরণাভূমি হিসেবে রামগড় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেখানকার অনাবিল প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বোধহয় কবিমন অনেকবেশি ঐকাত্ম্য অনুভব করত। দীর্ঘকাল যেখানে কবি কাটিয়েছিলেন; তাঁর সেই নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের জমিদারি তালুকের প্রকৃতির তুলনায় রামগড়ের নিসর্গ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামগড়:**

পাহাড়-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশেষ আগ্রহ। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে বাল্যকালে হিমালয় ভ্রমণের উল্লেখ করেছেন। ১৯০৩ সালে তিনি আলমোড়া যান। সেখানে হিমালয়ের নির্মল পরিবেশে তাঁর অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে নিয়ে এক ভাড়াবাড়িতে ওঠেন কন্যার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকমাস পরেই, মাত্র বারো বছর বয়সে রেণুকা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মারা যান।

১৯১৩-র কোনও এক সময়ে, পুত্র রথীন্দ্রনাথের  উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ দশহাজার টাকায় নৈনিতাল আর আলমোড়ার মাঝে রামগড়ে একটা বিশাল বাগানবাড়ি কিনে নেন। বাগানটিতে ছিল আপেল, চেরি, পেয়ারা এবং পিচফলের গাছ। বাড়িটির 'স্লো ভিউ পয়েন্ট' নাম বদলে রবীন্দ্রনাথ নতুন নামকরণ করেন 'হৈমন্তী'।

৮ মে ১৯১৪ তারিখ তাঁর ৫৩-জন্মবর্ষপূর্তির দিন কবি তাঁর সহযোগী উইলিয়ম পিয়রসনকে লেখেন, 'পরের রবিবার আমি রামগড় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।' দুদিন বাদে তিনি তাঁর বন্ধু, ইংরেজ যাজক সি.এফ.অ্যান্ড্রুজকে গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলো রামগড়ে কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন:

"আমার সঙ্গে এই পাহাড়ে থাকবার জন্য আপনি কবে আসবেন? আমার মনে হচ্ছে আপনি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন, এবং সেইজন্য আপনার এখন খানিকটা বিশ্রাম দরকার। এই ছুটির মধ্যে আর আপনাকে আমি কাজ করতে দিচ্ছিনে! আমরা এখানে ছুটি কাটাবার বিশেষ কোনও পরিকল্পনা ছকে নিয়ে আসিনি। এখানে খুব ক'দিন কুঁড়েমি করে কাটানো যাবে; যতক্ষণ না কুঁড়েমিটা অসহ্য হয়ে উঠবে!"

বৌমা প্রতিমা দেবী, জামাতা নগেন্দ্রনাথ, কন্যা মীরা দেবী এবং দুজন গৃহপরিচারককে সঙ্গে নিয়ে ওইদিনই কবি রামগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। গন্তব্যে পৌঁছনোর পথকষ্ট সত্ত্বেও রামগড় জায়গাটা তাঁর তৎক্ষণাৎ ভাল লেগে গেল। সেসময় কাঠগোদাম থেকে রামগড় পর্যন্ত  ১৬মাইল পথ মোটর চলাচলের উপযোগী ছিল না। ঘোড়া আর ডাণ্ডি চড়ে যাওয়াই ছিল তখন এপথের দস্তুর। ১৪ মে কবি অ্যান্ড্রুজকে লিখছেন:

'এখানে এসে মনে হচ্ছে পৃথিবীর এরকম একটা জায়গাতেই আমি আসতে চেয়েছিলাম।---অন্ধ অবিশ্বাসের কূপে এতকাল একলা কাটিয়ে দেওয়ার দুঃখে আজ নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছে জানু পেতে ক্ষমা চেয়েছি। চারপাশের পাহাড় দেখে মনে হচ্ছে সে যেন শুভ্রশান্তি আর সূর্যকিরণে উদ্বেল একটা পান্নাবোঝাই জাহাজ! নির্জনতা এমন এক পুষ্প যার থেকে ছড়িয়ে পড়ে সৌন্দর্যের

পাপড়িগুলো; আর মনের মধ্যে জমা হতে থাকে মননের মধু। আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর কোনও দুঃখ বা অসম্পূর্ণতার বেদনা নেই।'

এই আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে রয়ামগড়ে লেখা কবির এই গানে: 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' রামগড় বাসকালে রবীন্দ্রনাথ আর যা-যা লিখেছেন তা হচ্ছে এইরকম:

দুজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে (গান)

হৈমন্তী (ছোটগল্প)

আষাঢ় (নিবন্ধ)

১৭ মে: চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে (গান)

১৮ মে: গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা (গান)

১৯ মে: এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে (গান)

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো (কবিতা)

২০ মে: আমরা চলি সমুখ পানে(কবিতা)

সন্ধ্যা হল গো (গান)

২৪ মে: এই তো তোমার আলোকধেনু(গান)

২৬ মে: তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে (কবিতা)

১ জুন: ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে, পূজার ছায়ে(গান)

১৭ মে ১৯১৪ গুরুদেব তাঁর পিতৃদেবের ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে রামগড়ে একটি উপাসনার আয়োজন করেন। অ্যান্ড্রুজকে এদিন তিনি লিখছেন, 'মনে হচ্ছে এদিন যেন অধ্যাত্মজীবনে পুনর্জন্ম হল। খুব বেদনার মধ্যেও মহৎ এক প্রাপ্তিবোধে ভরে উঠল মন।' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও শিক্ষক, তৎসহ সি.এফ.অ্যান্ড্রুজ রামগড়ের সেই স্মরণীয় গ্রীষ্মাবকাশে কবির সঙ্গে যোগ দিলেন। তরুণ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ কাছের জঙ্গলে বন্যপ্রাণী শিকারে গিয়ে একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন একদিন। সেদিন জঙ্গলে তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত হল একটা অদ্ভুত ভালুকের সঙ্গে যার মুখে লেগেছিল হাসির আভা! সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে রথীন্দ্রনাথ একটা গল্প লিখেছিলেন। 'পিতৃস্মৃতি' বইতেও সেই অভিজ্ঞতার কথা খানিকটা বলেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। স্থানীয় এক মানুষের কথাও লিখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল যাবৎ যার মারাত্মক খিঁচুনির অসুখ ছিল। গুরুদেবের দেওয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধে শেষপর্যন্ত লোকটার রোগ সারে। এরফলে তৎক্ষণাৎ 'ডাক্তার' হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে রামগড়ে। চিকিৎসার জন্য দলে দলে রোগী আসতে থাকে কবির কাছে। অল্প দুয়েকটা পরিবার ছাড়া রামগড়ে কবির বসতবাড়ি ছিল জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে সুইটেনহামের পরিবার ঠাকুর পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং মাঝে মাঝে চায়ের আসরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করতেন। মুকুল দে তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, রামগড়ে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ তিনটি পেন্সিল স্কেচ আঁকেন। এর প্রায় একদশক বাদে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। রামগড়ে থাকতেই কবি এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের একটি চুক্তিপত্রে সই করেন। রামগড়ে ঘটনাবহুল গ্রীষ্মাবকাশ উদ্‌যাপনের পর ডাণ্ডিতে না চড়ে বাড়িফেরার জন্য কবি অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে ১৬মাইল উৎরাই পায়ে হেঁটে পর্বতের পাদদেশে কাঠগোদামে এসে পৌঁছন।

রামগড় তাঁর কবিসত্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এখানকার মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ অনুভব করে চলেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা ৮ নভেম্বর ১৯১৪ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমি এখানে [কলকাতায়] রামগড়ে আমাদের বিদ্যালয়ের একটা শাখা খোলার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছি।' রামগড়ের সুদূর পাহাড়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শাখা খোলার ব্যাপারে কবি ঠিক কী ভাবছিলেন তা খুব স্পষ্ট নয়। আলমোড়ার মতো সেইসময় রামগড়ও ছিল প্রকৃতির কোলে স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের ঠিকানা। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের গুরুতর পীড়া হলে তাদের বায়ুপরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য রামগড়ে একটা আশ্রমের শাখা তৈরি করা হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল: —এমন সম্ভাবনা অন্তত উড়িয়ে দেননি রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। অন্য একটি চিঠিতে সি.এফ.অ্যান্ড্রুজকে ১৫ নভেম্বর ১৯১৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

'শোনা যায়, রামগড় শীতকালে তেমন সুবিধাজনক জায়গা নয়। আর সেইজন্যই আমার ইচ্ছা করে গ্রীষ্মকালের মনোহারী ঋতুতে মানুষের ভিড় জমার আগে সেখানকার নির্মল প্রকৃতির মধ্যে সামনের কয়েকটা মাস কাটিয়ে আসি। তা সম্ভব হোক আর না-ই হোক, ঠিক করেছি মানুষের নিত্যসংস্রব থেকে কিছুকাল দূরে থাকব। আজ রাতেই বোলপুর থেকে যাত্রা শুরু করব। বম্বে মেল ধরে ১৮ নভেম্বর বুধবার রওয়ানা দেব। সঙ্গে যাবে রথী। হয়তো বৌমাও যাবে।'

আবার ১৭ নভেম্বর অ্যান্ড্রুজকে লিখছেন, 'আজ রাতে আমি রামগড় রওয়ানা হচ্ছি। কবে ফিরব তা জানি না। সেসব স্থির করার ভার আমার জীবনদেবতার উপর! আশাকরি যতদিন না বরফ গলে নদীগুলো সমতলে ছুটে যায় ততদিন তিনি আমার রামগড়বাস মঞ্জুর করবেন।' রামগড়ের রুক্ষশীতল আবহাওয়ার কারণে কবিকে তাঁর রামগড়বাসের পরিকল্পনা খানিকটা বদলাতে হয়। তিনি রামগড় থেকে আগ্রায় নেমে আসেন। ৩০ নভেম্বর তিনি অ্যান্ড্রুজকে লেখেন, 'এবারে হিমালয় আমাকে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল না। বিদায়টাও হল শীতল, নিরানন্দময়। আমাদের বাড়ির অবস্থাটা শীতকালে থাকার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। আমরা সূর্যাস্তের আলো একেবারেই পেতাম না। আর সন্ধে হতেই একটা হাড়হিম করা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকত ঘরে।' রবীন্দ্রনাথ রামগড়ে আরও জমি কিনতে চেয়েছিলেন। অ্যান্ড্রুজকে তার বন্দোবস্ত করতে এলাহাবাদ যেতে হয়েছিল। এলাহাবাদে এসে গভর্মেন্ট হাউস থেকে ২৩ নভেম্বর অ্যান্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে জানান:

‘রামগড়ের অধিত্যকায় বাড়ি করার ব্যাপারে কথা বলার জন্য এখানে স্যর জেমস্ মেস্টনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষকে নাগালে পাওয়ার এই হল সেরা উপায়। [তিনি নিজেও] এব্যাপারে আগ্রহী। [তিনি ভেবেছিলেন] ব্যাপারটা খুব কঠিন হবে না তবে [তিনি ভয় পেয়েছিলেন] জঙ্গলের জিদ্দি মানুষগুলোকে। তবে স্থানীয় শাসক হচ্ছেন সর্বক্ষমতার অধীশ্বর। এবং [তিনি] বিশ্বাস করেন আমাদের জয় হবেই।’

১৯৩৭ সালে তাঁর প্রয়াণের চারবছর আগে কবি একমাসের বেশি সময় কাটিয়েছিলেন আলমোড়ায়। সেইসময় তিনি রামগড় গিয়েছিলেন কিনা; বা তাঁর ‘হৈমন্তী’ বাড়িতে উঠেছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। রামগড়ে তাঁর বিদ্যালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে রামগড় সম্পর্কে তাঁর অনুকূল মন্তব্য থেকে বোঝা যায় হিমালয়ের কোলের এই জায়গাটার সঙ্গে কবির একটা মানসিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সেইজন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে শান্তিতে নির্জনবাসের জন্য কবির রামগড়ে জমি কিনে সময় কাটানোর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা রামগড়ে তিনি সৃষ্টিকর্মের অনুপ্রেরণা পেতেন।

## উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

গুরুদেব চেয়েছিলেন রামগড়ে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শাখা খুলতে যা তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভবপর হয়নি। রামগড়ে বিশ্বভারতীর একটি উপকেন্দ্র স্থাপন করে এখন তাঁর স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করে তোলা হচ্ছে। এরফলে বিশ্বভারতীর আদর্শের মধ্যে নিহিত বিশ্বব্যাপী বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাসঞ্চারের যে ধারণা তা বাস্তবে রূপলাভ করতে চলেছে। আমাদের প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন সম্ভবই হত না, যদি না প্রস্তাব পেশ হওয়ামাত্রই মাননীয় আচার্য তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী এবং ভারত সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন! মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই আমরা এর একটা বিস্তারিত প্রকল্প-প্রতিবেদন(ডিপিআর) প্রস্তুত করতে সমর্থ হই। ডিপিআর প্রস্তুতির সময় আমরা স্মরণে রাখি (ক)প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট আয়তন এবং (খ) আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২০২০ সালের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ডিপিআর-এ শিক্ষার্থীদের অর্থপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে পরিকল্পনা রচনা করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে:

‘[নতুন শিক্ষানীতি হবে] ভারতীয় মূল্যবোধের শিকড়স্পর্শী, যা সবার জন্য শিক্ষার উৎকর্ষসাধন করে ভারতবর্ষকে ন্যায়সংগত ও প্রাণবন্ত একটি বিদ্যাসমাজ উপহার দেবে; এবং এইভাবে ভারতবর্ষকে বিশ্বে জ্ঞানচর্চার একটি পরাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে।’ (জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০, পৃ.৬)।

শিক্ষা যে জাতিগঠনের একটি অতীব কার্যকর উপায় তার সমর্থন মেলে ইতিহাসে। একটি বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র হিসেবে গুরুদেব বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯২১ সালে কলকাতা মহানগরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। এটা সম্ভবই হত না যদি না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করতেন। ঔপনিবেশিক পর্বে যান্ত্রিকভাবে নগরায়িত রাজধানী কলকাতা থেকে দূরবর্তী এই প্রান্তর তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গুরুদেবের চিন্তাধারাও ছিল অনুরূপ। একই কারণে তিনি হিমালয়ের কোলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র, যেখানে নাগরিক

জীবনের স্পর্শদোষ ঘটেনি। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে মাননীয় আচার্য শ্রীমোদী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপোখরিয়ালের তত্ত্বাবধানে ভারত সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় বিশ্বভারতী কবির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রীপোখরিয়াল নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে চলেছেন।

আগেই বলেছি, উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে ক্যাম্পাস স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা এইকথাটা স্থির করে নিয়েছিলাম যে এই ক্যাম্পাস স্থাপন অর্থহীন হবে, যদি না এই প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরে-বাইরের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি না জোগায়; বা জাতিগঠনে ছেলেমেয়েদের কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে না পারে। সেইজন্যই, বিশ্বভারতীর রামগড় ক্যাম্পাসে প্রথমে চালু হবে চারটি বিদ্যায়তনিক কেন্দ্র: (ক) সমাজবিজ্ঞান ও গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র (খ) ভাষাচর্চা কেন্দ্র (গ) জননীতি ও উত্তম শাসন-পরিচালনা কেন্দ্র এবং (ঘ) হিমালয়চর্চা কেন্দ্র। অনেকগুলি বৈঠকে নিবিড়ভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার পর আমাদের সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা এই চারটি কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছন। আলোচনায় এও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-নীতি রচনা এবং স্থানীয় চাহিদা ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিক্ষাচর্চার কেন্দ্রসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় নমনীয় থাকবে। ডিপিআর রচনার সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপোখরিয়াল স্বয়ং কিছু কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন বলে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যেহেতু এটি একটি ধারাবাহিক প্রকল্প হতে চলেছে সেজন্য আমরা আশা করব, হিমালয়ের কোলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন-পরিকল্পনা এবং তার মধ্য দিয়ে গুরুদেবের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবনা-বিস্তারে ও লক্ষ্যপূরণে নিশ্চয়ই আরও মূল্যবান পরামর্শ আসবে।

সেখানে কী কী পড়ানো হবে তার কথা এবার একটু বলা যাক। *প্রথমত*, সমাজবিজ্ঞান ও পল্লি-উন্নয়নচর্চা কেন্দ্রে যথাক্রমে (ক)সমাজকর্ম ও (খ) পল্লিউন্নয়নচর্চার চূড়ান্ত পর্যায়ে সংহত (ইন্টিগ্রেটেড) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হবে। দুটি কেন্দ্রের অধীনে আবার থাকবে দুটি বিশেষ পাঠক্রমের পার্শ্বকেন্দ্র । একটি 'সার্বিক বিকাশ ও ন্যায়' এবং অন্যটি; আমাদের শ্রীনিকেতনে যাকে 'পল্লিসম্প্রসারণ কেন্দ্র' বলি— সেই লক্ষ্যেই গঠিত পল্লিউন্নয়ন ও গ্রামীণ সংযোগের বিশেষ চর্চাকেন্দ্র। *দ্বিতীয়ত*, ভাষাচর্চা কেন্দ্রের মধ্যে থাকবে সংস্কৃত, হিন্দি এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য বিপন্ন ভাষাসমূহ; যা চর্চা ও আগ্রহের অভাবে দ্রুত লোপ পেতে চলেছে। এই বিপন্ন ভাষাগুলির চর্চা খুবই জরুরি কেননা এগুলির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও আমরা বেমালুম হারাতে বসেছি। কী ঔপনিবেশিক পর্বে, কী উপনিবেশ-উত্তর পর্বে— ওই ভাষাগুলো আঁকড়ে ধরে-থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে তুলে ধরে বা রক্ষা করে ভারতীয় 'জাতি' চরিত্রটিকে যথাযথভাবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। *তৃতীয়ত*, জননীতি ও শাসন-পরিচালনার আঙ্গিক ও নীতি বিষয়ের বিদ্যাচর্চায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি এবং জনপ্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের 'জননীতি ও উত্তম শাসন-পরিচালনা' শিক্ষাকেন্দ্রে আকৃষ্ট হবেন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রেও কেন্দ্রটি প্রত্যেক বিষয়ে একটি সংহত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেবে, তাছাড়া 'জননীতি ও শাসন-পরিচালনা'তেও দেওয়া হবে অনুরূপ ডিগ্রি। এই ডিগ্রিটা হবে আন্তর্বিদ্যামূলক; কেননা এর পাঠক্রম পড়াবেন পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির বিশেষজ্ঞেরা। *শেষত*, হিমালয় অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটি বিদ্যাচর্চার ভাণ্ডার গড়ে উঠবে যেখানে সেখানকার বিশেষ ভূগোল, ইতিহাস এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

পরিমণ্ডল পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। হিমালয়ের মানুষ, তাঁদের সমাজ, এবং তাঁদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় এখনও গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার অন্তর্গত হয়নি, বা হতে পারে বলেও ভাবা হয়নি এতকাল! আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হল এখানে সেই আদর্শগত উপায়গুলি উদ্ভাবন করা যার সাহায্যে জননীতি প্রণয়নে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় কার্যকর নীতি-নির্ধারণে সহযোগিতা করা যায়; যাতে ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন এই ঐতিহাসিক ভূখণ্ডের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরম্পরা সমগ্র দেশের আবেগস্পৃষ্ট ভারতবোধের সঙ্গে সংযুক্ত ও সংরক্ষিত থাকতে পারে।

উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় উপকেন্দ্র স্থাপন বস্তুত গুরুদেবের আন্তরিক নিরীক্ষা ও আগ্রহের পরম প্রকাশ ছিল; যার মধ্য দিয়ে তিনি অভিনবভাবে তাঁর বিদ্যাকেন্দ্রের আদর্শের সৃজন ও সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। মুখস্ত করা অসার শিক্ষার বিকল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাভাবনার যে আদর্শ রচনা করেছিলেন তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ২০২০ সালের নতুন শিক্ষানীতিতে। ব্রিটিশপর্বে, বিশেষভাবে ভারতীয়দের মধ্যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ সেই যান্ত্রিক, আন্তরিকতাবর্জিত, কায়েমি ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারা প্রত্যাখ্যান করে নতুন শিক্ষা ও শিক্ষণের সজীব সৃজনাত্মক ভাবনা রূপায়ণ করেছিলেন। এটা মানতেই হবে যে স্বাধীন ভারতেও চিত্রটা তেমন কিছু বদলায়নি; খুব সম্ভব তার কারণ আমাদের মানসিকতার মধ্যেই পরপীড়নের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আজও দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এই শিক্ষার ফলে, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের বঞ্চনার মূল্যে কিছুমানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার একটা কৌশল বজায় রাখা যায়!

## বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে পিপিপি ধাঁচায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নির্মাণ

বর্তমান বিশ্বভারতী প্রশাসনের ভাবনাচিন্তার অন্যতম একটি বিষয় হল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে একটি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। একাদশ পরিকল্পনায়(২০০৭-২০১২) পিয়রসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল কমপ্লেক্সের মধ্যে একটি উন্নত পরিকাঠামোর হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আমরা ১৩.৩৭ কোটি টাকা অর্থমঞ্জুরি পাই। তার বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু অর্থমঞ্জুরি রদ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বভারতীর একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে! অন্যভাবে বললে, বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে জনগণের করের টাকায়, কিন্তু সরকারি কোষাগারের এত অর্থব্যয়ে নির্মিত সেই বাড়ির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হল না আজও! এ হচ্ছে নভেম্বর ২০১৮ সালের কথা যখন আমি বিশ্বভারতীতে যোগ দিই। প্রথমে আমি মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রককে সুপার-স্পেশালিটির সুবিধাযুক্ত হাসপাতালটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থমঞ্জুরির আবেদন জানাতে সচেষ্ট হই। আমার চেষ্টা জলে গেল, কেননা ততদিনে সরকার এইজাতীয় বিষয়ে তাঁদের নীতি পরিবর্তন করেছেন। তার পরিবর্তে তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই অর্থসংগ্রহ করে হাসপাতাল তৈরি করার পরামর্শ দিলেন। এর পাশাপাশি সরকার পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ) ধাঁচায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করার পক্ষপাতী বলে জানা গেল। হাসপাতালের জন্য অর্থসংগ্রহ কীভাবে হতে পারে সেইদিকটি আমরা খতিয়ে দেখতে শুরুও করলাম, কিন্তু টাকার প্রয়োজনটা এত সাংঘাতিকরকম বেশি ছিল যে সেদিকে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। তখন আমরা পিপিপি মডেলের দিকেই এগোলাম; এবং এটা আপনাদের জানাতে ভাল লাগছে যে অনেক সুপার-

স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিশ্বভারতীর হাসপাতাল পরিচালন কমিটি আগ্রহী প্রত্যেক সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যখন এইপর্ব একসময় শেষ হল তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের শরণাপন্ন হলাম; এবং তাঁরাও তৎক্ষণাৎ সরকারি নীতি-অনুসারী এই পিপিপি মডেলের প্রকল্প-উদ্যোগটিকে স্বাগত জানালেন। ১৮জুন ২০২০ তারিখ ভিডিয়ো কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে আয়োজিত অর্থসমিতির বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপিত হয়, যেখানে মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের মাননীয় যুগ্মসচিব শ্রীসিএস কুমার এবং মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের মাননীয় যুগ্মসচিব শ্রীজেকে ত্রিপাঠী উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত কিছু সংশোধনীসহ চূড়ান্ত প্রস্তাবটি মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় চেষ্টাচরিত্র আগে তেমন মনোযোগ পায়নি। আমি যোগ দেওয়ার পর খেয়াল করেছি, এখানে ভাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকলে কিছু মানুষের মৃত্যু হয়তো এড়ানো যেত। এটা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না, কারণ আমাদের পিএম হাসপাতালের তেমন উপযুক্ত পরিকাঠামোই নেই। তখনই আমি মনে মনে অঙ্গীকার করি— ক্যাম্পাসে একটা সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল বানাতেই হবে। আমার বলতে খুব ভাল লাগছে যে, আমার সহকর্মী যাঁরা হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং কর্মসমিতির সদস্য, তাঁরা কাজটা সহজ করে দিয়েছেন। তারসঙ্গে অবশ্যই মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের সাগ্রহ-সহযোগিতা হয়েছে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে আমাদের কাছে আশীর্বাদের মতো। মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক আনুকূল্য করে বিশ্বভারতীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রকল্প-রূপায়ণে পথনির্দেশ করে চলেছেন, যাতে সম্ভাব্য অন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা সহজে এড়ানো যায়।

**সমাপ্তিকালীন মন্তব্য**

আপাতত এই হল আমার শেষ বার্তালাপ। সেজন্য এখানে সমাপ্তিকালীন কিছু মন্তব্য করা বোধহয় অসমীচীন হবে না। এই দশটি বার্তালাপে আমার মুখ্য অন্বেষণ ছিল বিশ্বভারতীকে ভিতর থেকে বোঝবার চেষ্টা করা, এবং সম্ভব হলে তার পরিচালনা-পদ্ধতির প্রশ্নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন প্রস্তাব করা;— যাতে 'ন্যাক' ও এনআইআরএফ র‍্যাংকিং-এ বিশ্বভারতী ভাল ফল করতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী, শুভানুধ্যায়ী বা অন্যকোনওভাবে যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত তাঁরা যদি লক্ষ্যপূরণে আন্তরিকভাবে প্রযত্নশীল হন, তাহলে আমরা সহজেই সংকল্পসাধন সম্ভব করতে পারব। খুব স্পষ্টভাবে বললে যে-বিষয়গুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে আমি বাধ্য হয়েছি তা হল: (ক) অডিট আপত্তি (খ) মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের নির্দেশ পালন। যদি অডিট আপত্তি শুধরে নিয়ে ক্যাগ-কে সন্তুষ্ট না করতে পারি, তাহলে ইউজিসি এবং মন্ত্রকের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে তার বিরূপ প্রভাব পড়বে কিন্তু আমাদের সবার উপরেই। প্রশাসনের লক্ষ্য হল বিশ্বভারতীকে এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করা। এই বিশৃঙ্খলা থেকে বিশ্বভারতীকে বাঁচাতে হলে আমাদের সমবেতভাবে কাজ করে যেতে হবে; যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধির মূলে! আমাদের কর্তব্য হল বিশ্বভারতীর অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ; বা বিশেষ করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে যদি কারোর কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি তা বলতেই পারেন, কারণ উপাচার্যের উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমার কাজ করার ধরন হল সহকর্মীদের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া; এবং, অনেকেই জানেন, সেই সিদ্ধান্ত হয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য-অভিমুখী। আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের সমাজ বা মতাদর্শের প্রতি কোনও দৃঢ় অঙ্গীকার নেই। যাঁরা মুখে নিজেদের *রাবীন্দ্রিক/ আশ্রমিক/ প্রাক্তনী* হিসেবে দাবি করে থাকেন, সত্যি বলতে তাঁদের প্রতি আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। কেননা তাঁদের কাছে আমাদের যা প্রত্যাশা, আমরা পেয়েছি তার বিপরীত। এইসব মান্যবর *রাবীন্দ্রিক/ আশ্রমিক/ প্রাক্তনী*-দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ: আপনারা এমন অসংগত আচরণ করবেন না যাতে বিশ্বভারতীর মঙ্গল হওয়ার পরিবর্তে কোনও অনভিপ্রেত অমঙ্গল হয়।

এই বার্তালাপগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল ‘ন্যাক’ ও এনআইআরএফ র‍্যাংকিং-এ বিশ্বভারতী কী করে ভাল ফল করতে পারে তা নিয়ে একটা বিতর্কের সূচনা করা। আমাদের সহকর্মীরা এই লক্ষ্যে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। যদিও শুধু র‍্যাংকিং বিশ্বভারতীর অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয় না, তবে ভবিষ্যতের জন্য তা একটা পাকাপোক্ত ভিত তৈরি করবে। বিশ্বভারতী শুধু তাঁদের জন্য নয় যাঁরা এখানে কর্মসূত্রে থাকেন। বিশ্বভারতী তাঁদের জন্যও যাঁরা এই বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র থেকে বৌদ্ধিক রসদ ও প্রেরণা পেয়ে থাকেন। বিশ্বভারতীতে বিদ্যাসৃজন ও বিদ্যাসঞ্চারের আদর্শ পরিবেশ রচনা ও তাকে একটি উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন যে এটা একেবারেই অসম্ভব যদি না আমরা (শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট আর সবাই) পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি! আমাদের অহংভাব ত্যাগ করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে আমাদের উপর ন্যস্ত উত্তরাধিকারের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য, যাতে আমরা বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংযোগসূত্রে স্বাভাবিকভাবে অর্জিত পরম্পরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এখানে ‘আমরা’ বলতে আমি বোলপুরবাসীদেরও যুক্ত করতে চাই। এই উত্তরাধিকার মহর্ষি এবং গুরুদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বমানবতাকে লক্ষ্যে রেখে। রবীন্দ্রনাথ সেই মানবতাবোধকেই রূপান্তরিত করেছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকারে;— যার নাম ‘বিশ্বভারতী’!

যেহেতু করোনা ভাইরাস আমাদের পৃথিবীকে তছনছ করে দিচ্ছে সেইজন্য আমি আমার পাঠকদের অনুরোধ করব: নিরাপদ থাকুন, অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ প্রতিবেশী পরিবারগুলির খোঁজখবর নিন; এবং সবসময় যা বলে এসেছি— শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে আপনারা আরও সংযুক্ত থাকুন।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ২৯/৮/২০২০

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India